• [৩] শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right against Exploitation)

শোষণ, লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা গণতন্ত্রের প্রধান শত্রু। কিন্তু 'শোষণ' (exploitation) কথাটি ব্যাপক ও সংকীর্ণ—উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ভারতীয় সংবিধানে সংকীর্ণ অর্থে 'শোষণ' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। সংবিধানের ২৩ নং এবং ২৪ নং ধারায় নাগরিকদের শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারটি স্বীকৃতিলাভ করেছে।

মানুষ ক্রয়-বিক্রয়, বেগার খাটানো ইত্যাদি নিষিদ্ধকরণ

সংবিধানের ২৩(১) নং ধারায় মানুষ নিয়ে ব্যবসা অর্থাৎ মানুষ ক্রয়-বিক্রয়, বেগার খাটানো (বিনা মজুরিতে শ্রমদানে বাধ্য করা) বা অনুরূপভাবে বলপূর্বক শ্রমদানে বাধ্য করা নিষিদ্ধ হয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় হোল—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ত্রয়োদশ সংবিধান সংশোধনী আইনে দাসপ্রথা ও বলপূর্বক শ্রম আদায়কে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু ভারতের সংবিধানে 'দাস-প্রথা' কথাটি ব্যবহার না করে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে শোষণ বন্ধ করার উদ্দেশে 'মানুষ ক্রয়-বিক্রয়' (traffic in human beings) কথাগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। 'মানুষ ক্রয়-বিক্রয়' বলতে এখানে দাস-প্রথা (slavery) ছাড়াও নীতি-বিগর্হিত বা অন্য উদ্দেশে নারী, শিশু প্রভৃতির বেচাকেনাকে বোঝায়। এছাড়া, বেগার খাটানোর মতো যে-কোন ধরনের বলপূর্বক কাজ করানো ভারতীয় সংবিধান নিষিদ্ধ করেছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সংবিধানের ২৩ নং ধারাটিকে কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন রাজ্যে অসৎ ব্যবসার উদ্দেশে নারী সংগ্রহ করা আইনগতভাবে নিষিদ্ধ কাজ বলে বিবেচিত হয়। মাদ্রাজ (বর্তমানে তামিলনাড়ু) সরকার 'মাদ্রাজ দেবদাসী (উৎসর্গ নিরোধক) আইন', ১৯৪৭ [the Madras Devadasi (Prevention of Dedication) Act, 1947] প্রণয়ন করে সংবিধানের ২৩(১) নং ধারাটিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। পার্লামেন্টেও অনুরূপ উদ্দেশে ১৯৫৮ সালে একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন (Suppression of Traffic in Women and Girls Act) প্রণীত হয়েছে।

ব্যতিক্রম

কিন্তু এই অধিকারের ব্যতিক্রমও রয়েছে। [i] জনস্বার্থে প্রয়োজন মনে করলে রাষ্ট্র ধর্ম, বর্ণ, জাতি ও শ্রেণী নির্বিশেষে সকলকে শ্রমদানে বাধ্য করতে পারে। [ii] এইভাবে রাষ্ট্র যদি সামরিক শিক্ষা গ্রহণ কিংবা সমাজসেবামূলক কার্য সম্পাদনকে বাধ্যতামূলক বলে আইন প্রণয়ন করে, তাহলে এই আইন সংবিধানের ২৩(১) নং ধারার বিরোধী বলে বিবেচিত হবে না।

অল্পবয়স্কদের রক্ষার ব্যবস্থা

সংবিধানের ২৪ নং ধারা অনুসারে, ১৪ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের খনি, কারখানা বা অন্য কোন বিপজ্জনক কার্যে (in any other hazardous employment) নিয়োগ করা নিষিদ্ধ হয়েছে। এই অধিকারটিকে বাস্তবায়িত করার জন্য ১৯৪৮ সালে 'কলকারখানা-সংক্রান্ত আইন' (Factories Act), ১৯৫২ সালে 'খনি-সংক্রান্ত আইন' (The Mines Act), ১৯৮৬ সালে 'শিশু শ্রমিক (নিষিদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন' [The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act] প্রভৃতি পার্লামেন্ট প্রণয়ন করেছে।

Scanned with CamScanner

উপসংহার

সংবিধানে শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার স্বীকৃতি লাভ করলেও ভারতে শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—একথা মনে করার কোন কারণ নেই। বরং উৎপাদনের উপাদানগুলির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকায় মালিকশ্রেণী অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করে নির্দয়ভাবে শোষণ করছে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রের নেতিবাচক ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাছাড়া, একটি সাম্প্রতিক সরকারী সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে, বিহার, ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশে এখনও প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ ভূমিদাস হিসেবে রয়েছে। এরা বংশপরম্পরায় জমিদারদের জমিতে শ্রমদান করার জন্য চুক্তিবদ্ধ। সর্বোপরি, ভারতে এখনও ১ কোটি ৬০ লক্ষ শিশু ও বালক-শ্রমিক রয়েছে। এদের বয়স ৫ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে। প্রাক্তন রাজীব-সরকারের শ্রমমন্ত্রী স্বীকার করেছিলেন যে, সরকারী ক্ষেত্রেও কিছু কিছু শিশু-শ্রমিককে নিয়োগ করা হয়েছে। রেলের কয়লা বাছাইয়ের অস্বাস্থ্যকর কাজে যেমন শিশু-শ্রমিকরা নিযুক্ত রয়েছে, তেমনি তামিলনাড়ুর দেশলাই প্রস্তুতকারী সংস্থায় বিপজ্জনক কাজেও ৪৫ হাজারের মতো শিশু-শ্রমিককে নিযুক্ত থাকতে দেখা গেছে। সুতরাং বলা যায়, সংবিধানে কেবল বলপূর্বক শ্রমদান নিষিদ্ধ করে কিংবা বেগার-প্রথার উচ্ছেদ ঘটিয়ে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন উৎপাদনের উপাদানগুলির ওপর সামাজিক মালিকানার প্রতিষ্ঠা।

Scanned with CamScanner

গঠনের মাধ্যমে। এরূপ ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞা হোল 'সর্বধর্ম সমভাব'।

• [৪] ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom of Religion)

ভূমিকা

হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, বৌদ্ধ, পার্শী প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের মানুষ যুগ যুগ ধরে ভারতে বসবাস করছে। ব্রিটিশরা ভারতকে নিজেদের পদানত রেখে শোষণ করার জন্য 'বিভক্ত করে শাসন করো' (Divide and Rule) নীতি অনুসরণ করেছিল। ফলে, হিন্দু-মুসলমান দু'টি ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষের মনে বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায় এবং শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ চরম আকার ধারণ করলে ভারত দ্বি-খণ্ডিত হয় ; জন্মলাভ করে ভারত এবং পাকিস্তান নামে দু'টি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। কিন্তু পাকিস্তান ধর্মীয় রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও ভারত ধর্ম-নিরপেক্ষ (secular) রাষ্ট্র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে।

ভারতের ধর্ম-নিরপেক্ষ চরিত্র

ভারত ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হলেও মূল সংবিধানের কোথাও এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি অর্থাৎ মূল সংবিধানে ভারতকে 'ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র' বলে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়নি। তবে প্রস্তাবনায় সব নাগরিকের ধর্ম, বিশ্বাস ও উপাসনা করার স্বাধীনতা সম্পর্কিত ঘোষণার মাধ্যমে ভারতের ধর্ম-নিরপেক্ষতা প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া, গণ-পরিষদে বিতর্কের সময়েও সংবিধান-প্রণেতাদের ধর্ম-নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। মূল সংবিধানে 'ধর্ম-নিরপেক্ষ' কথাটির উল্লেখ না থাকলেও ১৯৭৬ সালে ৪২-তম সংবিধান-সংশোধনের মাধ্যমে প্রস্তাবনায় 'ধর্ম-নিরপেক্ষ' কথাটি সংযোজন করা হয়েছে।

'ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র' বলতে কী বোঝায় তা বলতে গিয়ে অনন্তশায়নম্ আয়েঙ্গার গণ-পরিষদে মন্তব্য করেছিলেন, "ধর্ম-নিরপেক্ষ বলতে একথা বলতে চাই না যে, কোন ধর্মের প্রতি আমাদের

Scanned with CamScanner

বিশ্বাস নেই এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। 'ধর্ম-নিরপেক্ষ' কথাটির অর্থ হোল—রাষ্ট্র কোন বিশেষ ধর্মকে সাহায্য করবে না বা এক ধর্ম অপেক্ষা অন্য ধর্মকে প্রাধান্য দেবে না।" সুতরাং ধর্ম-নিরপেক্ষতা বলতে সব ধর্মকে সমান মর্যাদাপ্রদান বোঝায়। রাধাকৃষ্ণনের মতে, ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে অধার্মিক (irreligious), ধর্ম-বিরোধী (anti-religion) কিংবা ধর্ম বিষয়ে উদাসীন (indifferent to religion) রাষ্ট্রকে বোঝায় না। ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হোল এমন একটি রাষ্ট্র, যা ব্যক্তি ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকার করে, যা ধর্মীয় মতামত নির্বিশেষে সব ব্যক্তিকে নাগরিক হিসেবে গণ্য করে এবং যা সাংবিধানিকভাবে বিশেষ কোন ধর্মের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে না কিংবা বিশেষ কোন ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা বা বিরোধিতা করে না। এক কথায় বলা যায়, ধর্ম বিষয়ে রাষ্ট্র সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকে।

ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়

ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি মোটামুটিভাবে ভারতে বিদ্যমান। সংবিধানের ২৫-২৮ নং ধারাগুলিতে জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার স্বীকৃতিলাভ করেছে। প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতা এবং ধর্ম-স্বীকার, ধর্ম-পালন ও ধর্ম-প্রচারের স্বাধীনতা রয়েছে [২৫(১) নং ধারা]। সাধারণভাবে রাষ্ট্র কোন ধর্মীয় বিষয়ের ওপর হস্তক্ষেপ করতে না পারলেও [i] জন-শৃঙ্খলা, সমাজের স্বীকৃত নীতিবোধ, জন-স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের প্রয়োজনে এই অধিকারের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে। [ii] তাছাড়া, বিশেষ কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান কোন ধর্মাচরণের অঙ্গ কিনা তা বিচার-বিবেচনা করার ক্ষমতা আদালতের রয়েছে বলে ১৯৮৮ সালে সুপ্রীম কোর্ট হানিফ কুরেশী বনাম বিহার রাজ্য মামলায় রায় দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ, ধর্মের নামে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, জন-স্বার্থ প্রভৃতি বিঘ্নিত হলে কিংবা নরবলির মতো অমানবিক কার্যাবলী অনুষ্ঠিত হলে অথবা সতীদাহ, দেবদাসী-প্রথার মতো নীতি-বিগর্হিত আচার-অনুষ্ঠান চলতে থাকলে সামগ্রিকভাবে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি ব্যাহত হবে। তাই এসব প্রতিরোধ করার জন্য সঙ্গত কারণে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ একান্তভাবে প্রয়োজন। [iii] সংবিধানে একথাও বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র ধর্মাচরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক (economic), আর্থিক (financial), রাজনৈতিক (political), কিংবা অন্যান্য ধর্ম-নিরপেক্ষ (secular) কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করতে পারে [২৫(২)(ক) নং ধারা]। [iv] তাছাড়া, সামাজিক কল্যাণ (social welfare) সাধন ও সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ধর্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম। [v] এমনকি, হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে হিন্দু ধর্মাবলম্বী সব ব্যক্তির নিকট উন্মুক্ত করে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করার অধিকারী [২৫(২)(খ) নং ধারা]। সংবিধানে 'হিন্দু' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শিখ, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের 'হিন্দু' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সংবিধানের ১৯(১)(খ) নং ধারায় নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার কথা বলা হলেও শিখ ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে কৃপাণ ধারণ ও বহন শিখ ধর্মাচরণের অপরিহার্য অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়।

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ও তার নিয়ন্ত্রণ

ব্যক্তি ছাড়াও বিভিন্ন সম্প্রদায়কে সংবিধানে কতকগুলি অধিকার প্রদান করা হয়েছে। ২৬ নং ধারা অনুসারে প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায় বা এর যে-কোন অংশ (every religious denomination or any section) [i] ধর্ম বা দানের উদ্দেশে সংস্থা স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে ; [ii] নিজ নিজ ধর্ম-বিষয়ক কার্যকলাপ নিজেরাই পরিচালনা করতে ; [iii] স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন ও

Scanned with CamScanner

ভোগ-দখল করতে এবং [iv] আইন অনুসারে সেই সম্পত্তি পরিচালনা করতে পারবে। তবে রাষ্ট্র [ক] জন-শৃঙ্খলা [খ] নৈতিকতা ও [গ] জন-স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যে-কোন ধর্মীয় সম্প্রদায় বা তার অংশের উপরি-উক্ত অধিকারগুলিতে হস্তক্ষেপ করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে ১৯৮৮ সালের ২৬শে মে জারি করা 'ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান অপব্যবহার রোধ' নামক অর্ডিন্যান্সের কথা উল্লেখ করা যায়। পাঞ্জাবে দীর্ঘদিন ধরে উগ্রপন্থীরা গুরুদ্বারগুলিকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছিল। তা রোধ করার উদ্দেশে গুরুদ্বার আইন ও অস্ত্র আইনের পাশাপাশি এই অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়। এতে বলা হয় যে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে এখন থেকে কোন রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা, বিভেদ-বিদ্বেষ ছড়ানো, অবাঞ্ছিত অপরাধীদের আশ্রয়স্থল করে তোলা ও সেখানে অস্ত্র নিয়ে প্রবেশ শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। যাঁর বা যাঁদের ওপর এইসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনার আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব থাকবে, তিনি বা তাঁরাও শাস্তি পাবেন। শাস্তি হিসেবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পদ থেকে অপসারণ করা ছাড়াও ৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়। এমনকি, কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে বিধিভঙ্গকারী কাজের সংবাদ পুলিসকে না জানানোও দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে।

ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির অধিকার ও তার নিয়ন্ত্রণ

কোন বিশেষ ধর্ম বা ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রসার বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন ব্যক্তিকে কর-প্রদানে বাধ্য করা যায় না (২৭ নং ধারা)। কিন্তু মন্দির-দর্শন, পূজার্চনা ইত্যাদি ব্যাপারে রাষ্ট্র কর ধার্য করার পরিবর্তে বৃত্তি বা অনুদান (fee) ধার্য করে সংবিধানের এই বাধানিষেধটিকে এড়িয়ে যেতে পারে।

ধর্মীয় উদ্দেশে কর আদায় নিষিদ্ধকরণ

ভারতীয় সংবিধানে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে ধর্মীয় শিক্ষাদানের ওপর কিছু কিছু বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে। ২৮ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সম্পূর্ণভাবে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ধর্ম-বিষয়ক শিক্ষাদান করা যায় না। আবার, যেসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বা সরকারী অর্থে আংশিকভাবে পরিচালিত, সেগুলিতেও শিক্ষার্থীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অথবা অপ্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীর অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক করা যায় না। তবে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত কিন্তু কোন দাতা বা অছির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা দেওয়া যায় যদি দাতার উইলে কোন বিশেষ ধর্ম বিষয়ে শিক্ষাদানের কথা উল্লেখ থাকে।

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষাদান নিয়ন্ত্রণ

পরিশেষে মন্তব্য করা যেতে পারে যে, নাগরিক ও বিদেশী নির্বিশেষে সব ব্যক্তিকেই ভারতে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। রাষ্ট্র সব ধর্মের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার ফলে ভারতের ধর্ম-নিরপেক্ষ চরিত্র ভারতবাসীর গর্বের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্মের নামে ব্যবসা, ব্যভিচার, অন্যায় ও অবিচার প্রভৃতি যাতে সামাজিক কল্যাণ ও অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে, সেজন্য সংবিধান কর্তৃক আরোপিত বাধানিষেধগুলিকে বিশেষ মূল্যবান বলে মনে করা হয়। কিন্তু সাম্প্রতিককালে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ভয়াবহ আকার ধারণ করার ফলে ভারতের ধর্ম-নিরপেক্ষ চরিত্র চরম সংকটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। অযোধ্যায় রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ বিরোধকে কেন্দ্র করে হিন্দু ও মুসলমান সাম্প্রদায়িক দল ও সংগঠনগুলি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় মেতে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর তথাকথিত 'করসেবা'র নাম করে হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা বাবরি মসজিদটিকে সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করে দেয়। ফলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রাতৃঘাতী

উপসংহার

Scanned with CamScanner

দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়। ১৯৯৮ সালে 'ফায়ার' ছায়াছবির প্রদর্শনী বন্ধ ক'রে দেওয়া, গুজরাটে খ্রীস্টানদের ওপর ব্যাপক আক্রমণ চালানো ও গীর্জাতে অগ্নিসংযোগ করা, ওড়িশার কেওনঝড়ে দুই শিশুপুত্র-সহ খ্রীস্টান মিশনারী গ্রাহাম স্টেইন্‌স-কে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার মতো অনেক ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা। সম্প্রতি (২০০২) গুজরাটে গোধরা হত্যাকাণ্ডকে অজুহাত হিসেবে খাড়া ক'রে তারা সরকারী মদতে সংখ্যালঘু মুসলমানদের ওপর সীমাহীন অত্যাচার ও অমানবিক আচরণ চালাতে থাকলে সমগ্র রাজ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ে। ৭ই এপ্রিল সাবরমতী আশ্রমে অনুষ্ঠিত একটি শান্তি-সমাবেশের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তারা নর্মদা আন্দোলনের নেত্রী মেধা পাটকরকে নিগ্রহ করে। এমনকি, ঐসব দুষ্কৃতির সমর্থনে পুলিশ উপস্থিত সাংবাদিকদের ওপর বেপরোয়া ভাবে লাঠি চালাতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি। বলা বাহুল্য, হিন্দু-সাম্প্রদায়িক দল ও সংগঠনগুলি ধর্মকে হাতিয়ার করে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দখলের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করতেও সমর্থ হয়েছে। এইসব সাম্প্রদায়িক শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করতে হলে কঠোর, কঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের প্রয়োজন। সেই সংগ্রামে দলমত-নির্বিশেষে প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও ধর্ম-নিরপেক্ষ ব্যক্তি, রাজনৈতিক দল ও সংগঠনকে সামিল হতে হবে ; অন্যথায় ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আকাশ সাম্প্রদায়িকতারূপী কালনাগিনীর বিষবাষ্পে ভরে উঠবে। আমাদের 'মহান ভারত' ধর্ম-ব্যবসায়ীদের অবাধ বিচরণক্ষেত্রে পরিণত হবে।

● [৫] সংস্কৃতি ও শিক্ষা-বিষয়ক অধিকার (Cultural and Educational Rights)

সংস্কৃতি ও শিক্ষা-বিষয়ক অধিকার

গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হোল সুচিন্তিত জনমত। জনগণ যদি অজ্ঞতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার প্রভৃতিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটে না। আর, রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ না ঘটলে গণতন্ত্রের সাফল্যের স্বপ্ন দেখা বাতুলতা মাত্র। ভারতীয় সংবিধানের ২৯ নং এবং ৩০ নং ধারায় সংস্কৃতি ও শিক্ষা-বিষয়ক অধিকার ঘোষিত হয়েছে। ২৯ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সব শ্রেণীর নাগরিক নিজ নিজ ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ করার অধিকারী। এই অধিকারের স্বীকৃতির মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির স্বার্থ-সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া, রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত অথবা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার থেকে কোন ব্যক্তিকে ধর্ম, বংশ, জাতি বা ভাষার অজুহাতে বঞ্চিত করা যাবে না। তবে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রবেশাধিকারের জন্য উপযুক্ত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন।

সংবিধানের ৩০ নং ধারা অনুসারে ধর্ম অথবা ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি নিজেদের পছন্দমত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য প্রদানের বিষয়ে রাষ্ট্র কোনরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। এইসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় ভিত্তিতে আসন সংরক্ষিত রাখা যাবে না। এই কারণে মাদ্রাজ সরকারী কলেজে ধর্মের ভিত্তিতে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা সংবিধান-বিরোধী বলে বাতিল হয়ে যায়। আবার, রাষ্ট্র সংখ্যালঘুশ্রেণীর কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি অধিগ্রহণ করতে চাইলে তাকে 'পুরো ক্ষতিপূরণ' (full compensation) প্রদান করতে হবে [৩০(১-ক) নং ধারা]।

Scanned with CamScanner

[৬] সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার (Right to Constitutional Remedies)

সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলিকে লিপিবদ্ধ করা হলেই যে সেগুলি যথাযথভাবে সুরক্ষিত হবে এমন কোন কথা নেই। আইন বিভাগ কিংবা শাসন বিভাগ যে-কোন সময় অধিকারগুলির ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারে। তাই মৌলিক অধিকারগুলির পবিত্রতা রক্ষার জন্য সাংবিধানিক প্রতিবিধানের মাধ্যমে সেগুলিকে সংরক্ষণ করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ভারতীয় সংবিধানের ৩২ নং এবং ২২৬ নং ধারা দু'টিতে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য 'সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার' (Right to Constitutional Remedies) লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ভারতে সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকারের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে ড. আম্বেদকর গণ-পরিষদে মন্তব্য করেছিলেন যে, "আমাকে যদি সংবিধানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এমন একটি ধারার নাম করতে বলা হয়, যে-ধারাটিকে বাদ দিলে এই সংবিধান অর্থহীন (nullify) হয়ে পড়বে, তাহলে আমি এই ধারাটি (৩২ নং ধারা) ছাড়া অন্য কোন ধারার উল্লেখ করব না।" তিনি ৩২ নং ধারাটিকে 'সংবিধানের প্রাণকেন্দ্র' (the very soul of the constitution and the very heart of it) বলে বর্ণনা করেছিলেন। লক্ষণীয় বিষয় হোল—ভারতে নাগরিকদের অধিকারসমূহের সংরক্ষণ-ব্যবস্থাগুলি অর্থাৎ সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার নাগরিকদের অন্যতম মৌলিক অধিকার বলে বিবেচিত হয়।

সাংবিধানিক প্রতিবিধানের প্রয়োজনীয়তা

ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহকে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থাগুলি হোল :

[i] সংবিধানে শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপ ছাড়াও আইন বিভাগের হাত থেকে নাগরিক-অধিকারসমূহকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। সংবিধানের ১৩ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, কোন আইন মৌলিক অধিকারের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হলে সংশ্লিষ্ট আইনের অসামঞ্জস্যপূর্ণ অংশ বাতিল হয়ে যাবে। এখানে 'আইন' (law) বলতে আইনসভা-প্রণীত আইন ছাড়াও অধ্যাদেশ (ordinance), আদেশ (order), উপ-আইন (bye-law), নিয়মকানুন, প্রচলিত প্রথা (custom), রীতিনীতি (usage) ইত্যাদিকে বোঝায়। কোন আইন সংবিধানের তৃতীয় অংশে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের বিরোধী কিনা তা বিচার করার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের রয়েছে। এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে সুপ্রীম কোর্ট এ. কে. গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য-মামলায় ১৯৫০ সালে প্রণীত 'নিবর্তনমূলক আটক আইনে'র ১৪ নং অনুচ্ছেদটিকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছিলেন।

আইন বিভাগের হাত থেকে অধিকারগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা

[ii] মৌলিক অধিকারভঙ্গের বিরুদ্ধে নাগরিকদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ হোল সংবিধানের ৩২ নং এবং ২২৬ নং ধারা দু'টি। ৩২ নং ধারা অনুযায়ী মৌলিক অধিকারগুলিকে বলবৎ ও কার্যকর করার জন্য নাগরিকরা সুপ্রীম কোর্টের নিকট আবেদন করতে পারে [৩২(১) নং ধারা]। সুপ্রীম কোর্ট এই অধিকারগুলিকে বলবৎ করার জন্য 'বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ' (habeas corpus), 'পরমাদেশ' (mandamus), 'প্রতিষেধ' (prohibition), 'অধিকার-পৃচ্ছা' (quo-warranto) এবং 'উৎপ্রেষণ' (certiorari)—এই পাঁচ ধরনের 'লেখ' (writ), নির্দেশ বা আদেশ

সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার

Scanned with CamScanner

জারি করতে পারেন [৩২(২) নং ধারা]। অনুরূপভাবে, ২২৬(১) নং ধারা অনুসারে অঙ্গ-রাজ্যগুলির হাইকোর্ট বা মহাধর্মাধিকরণ সংবিধানের তৃতীয় অংশে বর্ণিত নাগরিক-অধিকারসমূহকে বলবৎ করার জন্য এবং 'অন্য যে-কোন উদ্দেশ্যে' (for any other purpose) পূর্ব-বর্ণিত 'লেখসমূহ' জারি করার অধিকারী। এইভাবে সুপ্রীম কোর্ট মৌলিক অধিকারসমূহকে বেআইনী হস্তক্ষেপের হাত থেকে রক্ষা করে নাগরিক-অধিকারসমূহের সংরক্ষক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছেন। লক্ষণীয় বিষয় হোল—'লেখ' জারি করার ব্যাপারে হাইকোর্টের ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা অপেক্ষা অনেক বেশি। কারণ, ৩২ নং ধারা অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্ট কেবল মৌলিক অধিকারগুলিকে বলবৎ করার জন্য 'লেখ' জারি করতে পারেন। কিন্তু ২২৬ নং ধারা অনুযায়ী হাইকোর্ট এই উদ্দেশ্য ছাড়াও 'অন্য যে-কোন উদ্দেশে' তা জারি করার অধিকারী। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২৮৬ নং ধারায় বর্ণিত বাধানিষেধ উপেক্ষা করে কোন রাজ্য-আইনসভা একটি বিক্রয়-কর (sales tax) ধার্য করলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের হাইকোর্ট এর বিরুদ্ধে 'লেখ' জারি করতে পারেন।

[iii] তাছাড়া, পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করে সুপ্রীম কোর্ট এবং হাইকোর্ট ছাড়া অন্য 'যে-কোন আদালতকে নিজ এক্তিয়ারের মধ্যে পূর্বোক্ত লেখসমূহ বা সেগুলির মধ্যে বিশেষ বিশেষ লেখ জারি করার ক্ষমতা' (any other court to exercise within the local limits of its jurisdiction all or any of the powers) প্রদান করতে পারে [৩২(৩) নং ধারা]। তবে অদ্যাবধি পার্লামেন্ট এই ধরনের কোন আইন প্রণয়ন করেনি।

অন্য আদালতের লেখ জারির ক্ষমতা

[iv] সংবিধানে বর্ণিত ক্ষেত্রগুলি ছাড়া অন্য কোনও ক্ষেত্রে ৩২ নং ধারায় গ্যারান্টি-প্রদত্ত শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকারটিকে বাতিল করা যাবে না [৩২(৪) নং ধারা]। এইভাবে কেবল জরুরী অবস্থা ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় নাগরিকদের সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকারকে খর্ব করা যায় না। এমনকি, জরুরী অবস্থায়ও রাষ্ট্রপতি আদেশ (order) জারি করে সংবিধানের ২০ নং এবং ২১ নং ধারায় বর্ণিত অধিকারগুলিকে খর্ব করতে পারেন না [৩৫৯(১) নং ধারা]।

সাধারণ অবস্থায় সাংবিধানিক প্রতি-বিধানের অধিকার

▸▸ *লেখ, আদেশ বা নির্দেশ (Writs, Orders or Directions)*

সংবিধানে বর্ণিত লেখ, আদেশ বা নির্দেশগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

✦ [ক] **'বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ' *(habeas corpus)*** ঃ 'বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ' কথাটির অর্থ হোল বন্দীকে আদালতে 'সশরীরে হাজির করা' (to have a body before the court)। কোন ব্যক্তিকে আটক করা হলে কী কারণে তাকে আটক করা হয়েছে, তা জানার জন্য সুপ্রীম কোর্ট বা হাইকোর্ট বন্দীর আবেদনক্রমে আটককারীর ওপর আদেশ জারি করে বন্দীকে আদালতকক্ষে উপস্থিত করার নির্দেশ দিতে পারেন। আবেদনকারীকে বেআইনীভাবে আটক করা হয়েছে বলে মনে করলে আদালত আটক ব্যক্তিকে মুক্তিদানের নির্দেশ দিতে সক্ষম। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সুপ্রীম কোর্ট কেবল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 'বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ' লেখ জারি করতে পারেন। কিন্তু হাইকোর্ট রাষ্ট্র এবং ব্যক্তি (private individual) উভয়ের বিরুদ্ধেই এই লেখ জারি করার অধিকারী। কিন্তু নিম্নলিখিত কয়েকটি ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট বা হাইকোর্ট 'বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ' লেখ জারি করতে পারেন না ঃ [i] নিজ এক্তিয়ার (jurisdiction)-এর বাইরে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার

Scanned with CamScanner

হলে আদালত এরূপ লেখ জারি করতে অক্ষম। [ii] ফৌজদারী অপরাধের জন্য কোন আদালত কর্তৃক হাজতবাসের দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির মুক্তির উদ্দেশে সুপ্রীম কোর্ট বা হাইকোর্ট 'বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ' লেখ জারি করার অধিকারী নন।

✦ [খ] **'পরমাদেশ' *(mandamus)*** ঃ 'পরমাদেশ' শব্দটির অর্থ 'আমরা আদেশ দিচ্ছি' (we order)। সুপ্রীম কোর্ট বা হাইকোর্ট কোন অধস্তন আদালত, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য পরমাদেশ জারি করতে পারেন। এই আদেশ জারি করে আদালত সরকারকে আইনসঙ্গত ও জনস্বার্থ-সম্পর্কিত কর্তব্য সম্পাদনে বাধ্য করেন। কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রপতি কিংবা কোন রাজ্যের রাজ্যপালের বিরুদ্ধে পরমাদেশ জারি করার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্ট বা হাইকোর্টের নেই।

✦ [গ] **'প্রতিষেধ' *(prohibition)*** ঃ 'প্রতিষেধ' কথাটির অর্থ 'নিষেধ করা'। এরূপ আদেশ জারি করে সুপ্রীম কোর্ট বা হাইকোর্ট যে-কোন অধস্তন আদালতকে তার এক্তিয়ার-বহির্ভূত কার্য সম্পাদনে বাধা দিতে পারেন। উর্ধ্বতন আদালতের এই নির্দেশ লঙ্ঘন করা হলে লঙ্ঘনকারীকে আদালত-অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত করা যেতে পারে। পরমাদেশের সঙ্গে প্রতিষেধের পার্থক্য হোল—***প্রথমতঃ,*** প্রথমোক্ত লেখটি কার্য সম্পাদনের জন্য নির্দেশ দেয়। কিন্তু শেষোক্তটি কার্য সম্পাদনে বাধাদান করে। ***দ্বিতীয়তঃ,*** পরমাদেশ অধস্তন আদালত, সরকার, সরকারী কার্যে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি প্রভৃতির বিরুদ্ধে জারি করা যায়। কিন্তু প্রতিষেধ কেবলমাত্র আদালতের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা হয়।

✦ [ঘ] **'অধিকার-পৃচ্ছা' *(quo-warranto)*** ঃ 'অধিকার-পৃচ্ছা'র অর্থ 'কোন্ অধিকারে'। কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন সরকারী পদ (public office) দাবি করে যে-পদের যোগ্যতা তার নেই, তাহলে সুপ্রীম কোর্ট বা হাইকোর্ট 'অধিকার-পৃচ্ছা'র দ্বারা এই দাবির বৈধতা অনুসন্ধান করতে পারেন। দাবিটি অবৈধ প্রমাণিত হলে আদালত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পদচ্যুত করার নির্দেশ দেন।

✦ [ঙ] **'উৎপ্রেষণ' *(certiorari)*** ঃ 'উৎপ্রেষণ' বলতে 'বিশেষভাবে জ্ঞাত হওয়া' বোঝায়। সুপ্রীম কোর্ট বা হাইকোর্ট কোন মামলার নিরপেক্ষ বিচার করার কিংবা নিম্নতন আদালতগুলির ক্ষমতা-বহির্ভূত কার্যে বাধাদানের জন্য তাদের নির্দেশ দিতে পারেন যে, মামলাটি শুনানীর জন্য উচ্চ আদালতে প্রেরণ করা হোক্। এরূপ আদেশ পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হতে পারে।

➽ *ব্যতিক্রমসমূহ (Exceptions)*

সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক অধিকারের মতো সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকারটিও অবাধ বা নিরঙ্কুশ নয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে এই অধিকারের ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। ব্যতিক্রমগুলি হোল ঃ

প্রথমতঃ, যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ কিংবা দেশের মধ্যে সশস্ত্র বিদ্রোহের ফলে সমগ্র দেশ বা তার কোন অংশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। এরূপ জরুরী অবস্থা ঘোষিত হলে সংবিধানের ১৯ নং ধারায় বর্ণিত স্বাধীনতার অধিকারগুলি অকার্যকর হয়ে যায়। তখন আইনসভা যে-কোন আইন প্রণয়ন করতে পারে এবং শাসন বিভাগ যে-কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম [৩৫৮(১) নং ধারা]।

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয়তঃ, জরুরী অবস্থার সময় রাষ্ট্রপতি আদেশ (order) জারি করে কেবল ২০ নং ও ২১ নং ধারায় বর্ণিত অধিকারগুলি ছাড়া অন্যান্য সব মৌলিক অধিকারকে কার্যকর করার জন্য আদালতে আবেদন করার অধিকার স্থগিত রাখতে পারেন [৩৫৯(১) নং ধারা]। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ৫৯-তম সংবিধান-সংশোধনের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল যে, দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হলে রাষ্ট্রপতি আদেশ জারি করে ২০ নং ধারায় বর্ণিত মৌলিক অধিকার ছাড়া অন্য যে-কোন মৌলিক অধিকারকে কার্যকর করার জন্য আদালতে আবেদন করার অধিকার স্থগিত রাখতে পারেন। কিন্তু ১৯৮৯ সালে প্রণীত ৬৩-তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ৫৯-তম সংবিধান সংশোধনী আইনটিকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয়তঃ, সশস্ত্র বাহিনী অথবা জন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিযুক্ত অন্যান্য বাহিনী (Armed Forces or the Forces charged with the maintenance of public order)-র যথাযথভাবে কর্তব্য-সম্পাদন সুনিশ্চিত করার জন্য এইসব বাহিনীতে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ কতখানি মৌলিক অধিকার ভোগ করতে পারবে, তা পার্লামেন্ট আইন প্রণয়নের মাধ্যমে স্থির করে দিতে পারে [৩৩ (ক) ও (খ) নং ধারা]। ১৯৮৪ সালে সংবিধানের ৫০-তম সংশোধনের মাধ্যমে গোয়েন্দা ব্যুরো বা সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই ধরনের কোন সংস্থার কিংবা সশস্ত্র বাহিনী, গোয়েন্দা ব্যুরো বা এই ধরনের সংস্থার টেলি-যোগাযোগ-ব্যবস্থা (telecommunication systems)-র কর্মীদের ক্ষেত্রেও পূর্বোক্ত বিধান কার্যকর হবে [৩৩(গ) ও (ঘ) নং ধারা]।

চতুর্থতঃ, ৩৪ নং ধারা অনুযায়ী ভারতের কোন অঞ্চলে সামরিক শাসন চালু থাকাকালীন কোন সরকারী কর্মচারী বা অন্য কেউ শৃঙ্খলা রক্ষা বা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কোন অবৈধ কাজ করলে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করে ঐসব কাজকে বৈধ বলে ঘোষণা করতে পারে। পার্লামেন্ট-প্রণীত এরূপ আইনকে 'দণ্ডনিষ্কৃতি আইন' (Indemnity Act) বলা হয়।

❑ মৌলিক অধিকারগুলি কি নিরঙ্কুশ? (Are the Fundamental Rights Absolute ?)

● সাধারণ অবস্থায় আরোপিত বাধানিষেধসমূহ (Restrictions imposed in Normal Circumstances)

ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলির ওপর যেসব বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে, সেগুলি হোল ঃ [১] রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, [২] বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন, [৩] শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গ, [৪] আদালত অবমাননা, [৫] মানহানি, [৬] অপরাধ অনুষ্ঠান বা অপরাধমূলক কার্যে প্ররোচনাদান এবং [৭] অশালীনতা ও অসদাচার প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্র মৌলিক অধিকারগুলি নিয়ন্ত্রণ বা খর্ব করতে পারে।

● বিশেষ অবস্থায় আরোপিত বাধানিষেধসমূহ (Restrictions imposed in Special Circumstances)

তাছাড়া, বিশেষ অবস্থায় রাষ্ট্র মৌলিক অধিকারগুলির ওপর নিম্নলিখিত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে ঃ

Scanned with CamScanner

✦ [১] সশস্ত্র বাহিনী অথবা সাধারণ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ভারপ্রাপ্ত বাহিনীর লোকদের ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারসমূহের প্রয়োগ-সংক্রান্ত নিয়মাবলী সংশোধন করার ক্ষমতা পার্লামেন্টের আছে। অবশ্য ঐসব ব্যক্তির কর্তব্যনিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতার প্রয়োজনেই কেবল পার্লামেন্ট অধিকারগুলির পরিবর্তন করতে পারে।

✦ [২] দেশে যদি সামরিক আইন বলবৎ থাকে, তবে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কেন্দ্র বা রাজ্যের যে-কোন কর্মচারীকে বরখাস্ত করার ক্ষমতা পার্লামেন্টের আছে।

✦ [৩] রাষ্ট্রপতি দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করলে আইনসভা দেশের সামগ্রিক প্রয়োজনে যে-কোন আইন প্রণয়ন করতে পারে। মৌলিক অধিকারসমূহের বিরোধী বলে আদালত সেই আইনকে বাতিল বলে ঘোষণা করতে পারেন না। ফলে জরুরী অবস্থায় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ কার্যত ভিত্তিহীন হয়ে পড়ে।

✦ [৪] ২৫-তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা করা হয় যে, ৩৯(খ) ও (গ) নং ধারায় বর্ণিত নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে কার্যকর করতে গিয়ে পার্লামেন্ট-প্রণীত কোন আইন সংবিধানের ১৪, ১৯ ও ৩১ নং ধারার বিরোধী বলে বাতিল হবে না। ১৯৮০ সালে মিনার্ভা মিলস মামলায় ৪২-তম সংবিধান সংশোধনী আইনের ৪ নং ও ৫৫ নং অনুচ্ছেদ দু'টিকে সুপ্রীম কোর্ট বাতিল করে দিলেও ২৫-তম সংবিধান সংশোধনীর পূর্বোক্ত অংশটি অপরিবর্তিত থেকে যায়। এর অর্থ—পূর্বোক্ত ধারায় বর্ণিত নির্দেশমূলক নীতিগুলি মৌলিক অধিকারের ওপর স্থান পেয়েছে।

উপসংহার

ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলির ওপর এত বেশি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার জন্য অনেকে জনগণের মৌলিক অধিকারের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁরা মনে করেন, ভারতীয় সংবিধান এক হাতে অধিকারগুলি প্রদান করে অন্য হাতে সেগুলি হরণ করেছে। তাছাড়া, মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক অধিকার স্বীকৃত না হওয়ার ফলে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলি মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। তাই সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে তৃতীয় অধ্যায়ে অর্থনৈতিক অধিকারসমূহকে লিপিবদ্ধ করে ভারতীয় গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করা একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় ভারতীয় গণতন্ত্র তত্ত্ব-সর্বস্ব নীতিকথার ঊর্ধ্বে কোনদিন নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না।

Scanned with CamScanner